১০.১০ গুপ্তযুগের শাসন-পদ্ধতি : বৈশিষ্ট্য এবং মৌর্য শাসন-পদ্ধতির সঙ্গে তার প্রভেদ : নানা সূত্র থেকে গুপ্ত শাসন-পদ্ধতি সম্পর্কে জানা সম্ভব হয়েছে যেমন : ফা-হিয়েনের বিবরণ, হরিষেণের এলাহাবাদ প্রশস্তি এবং গুপ্তসাম্রাজ্যভুক্ত বিভিন্ন অঞ্চলে আবিষ্কৃত লেখমালা। প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে, গুপ্ত আমলে গণরাজ্যগুলির বিলুপ্তি ঘটেছিল। চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত যেসব গণরাজ্য নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পেরেছিল গুপ্ত আমলে সেগুলোর বিলুপ্তি ঘটে। লিচ্ছবী গণরাজ্যের কুমারদেবীকে গুপ্ত-সম্রাট বিবাহ করেছিলেন বলে রাজ্যটি গুপ্তসাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন বা রাজ্যজয়ের ফলেই সম্ভবতঃ গণরাজ্যগুলোর অবসান ঘটে থাকবে।

গণরাজ্যগুলোর বিলুপ্তি

গুপ্ত শাসন-ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল রাজার ওপর দেবত্ব আরোপ। গুপ্ত-সম্রাটরা 'পরমদৈবত' বা সমতুল্য উপাধি গ্রহণ করতেন। ইতিপূর্বে শক-কুষাণ আমল থেকেই তা শুরু হয়ে গিয়েছিল, তবে গুপ্তদের আমলে রাজার দেবত্ব আরও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। গুপ্তসম্রাটরা ব্রাহ্মণদের উদার হাতে দান করতেন, আর তার প্রতিদানে ব্রাহ্মণরা রাজাকে বিভিন্ন দেবতার সঙ্গে তুলনা করে প্রজাদের আনুগত্যলাভে সম্রাটকে সাহায্য করতেন। ব্রাহ্মণরা অনুশাসন দিয়েছিলেন যে, গুপ্তসম্রাটরা মর্ত্যলোকে আবির্ভূত দেবতা বিষ্ণু।

রাজার ওপর দেবত্ব আরোপ

গুপ্তসাম্রাজ্যে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। গুপ্তরাজারা বংশানুক্রমিকভাবে রাজত্ব করতেন। সাধারণতঃ রাজা জ্যেষ্ঠপুত্রকেই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করতেন, তবে যোগ্য ব্যক্তিকে সিংহাসনে স্থাপন করবার প্রয়োজনে তার ব্যতিক্রম যে হত না তা নয়। রাজা বা সম্রাট ছিলেন গুপ্তসাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি। তবে তিনি স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। রাজকার্য পরিচালনায় তিনি একাধিক মন্ত্রী ও রাজকর্মচারীর সাহায্য নিতেন। তাছাড়া যুবরাজ ও অপরাপর রাজপুত্ররা এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করতেন।

রাজতন্ত্র ও রাজা

শাসনকার্য পরিচালনার ব্যাপারে গুপ্তসম্রাট রাজকর্মচারীদের সাহায্য নিতেন। গুপ্ত শাসন-ব্যবস্থায় আমলাতান্ত্রিক প্রাধান্য থাকলেও মৌর্য আমলের মতো তা এত ব্যাপক ও জটিল

আমলাতন্ত্র

কেন্দ্রীয় শাসন

ছিল না। মৌর্যদের মতো গুপ্তসম্রাটরাও শাসনব্যবস্থাকে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পর্যায়ে ভাগ করেছিলেন। তবে রাজা বা সম্রাটকে শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে পরামর্শ দেবার জন্য কোনো মন্ত্রিপরিষদের অস্তিত্ব ছিল কি না তা সঠিকভাবে জানা যায় নি। 'মন্ত্রী'রা ছিলেন সর্বোচ্চ রাজকর্মচারী। অপরাপর উচ্চ রাজকর্মচারীদের মধ্যে 'মহাবলাধিকৃত' (প্রধান সেনাপতি), 'মহাদণ্ডনায়ক' (সেনাপতি) ও 'মহাপ্রতিহার' (প্রধান দ্বাররক্ষী বা প্রাসাদরক্ষী) ও 'সন্ধিবিগ্রহিকা' (পররাষ্ট্রমন্ত্রী বা যুদ্ধ ও শান্তির মন্ত্রী) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অপর এক শ্রেণীর কর্মচারী যাঁরা গুপ্ত শাসন-ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন তাঁরা 'কুমারামাত্য'। কুমারামাত্য ও আযুক্ত নামে কর্মচারীরা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসনের মধ্যে যোগসূত্র বজায় রাখতেন।

প্রাদেশিক শাসন

শাসনকার্যের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য গোটা সাম্রাজ্যকে অনেকগুলো প্রদেশে বিভক্ত করা হয়েছিল। সেই আমলে প্রদেশের নাম ছিল 'দেশ' বা 'ভুক্তি' যেমনঃ অহিচ্ছত্র-ভুক্তি, শ্রাবস্তীভুক্তি, মুকুলিদেশ প্রভৃতি। প্রদেশের শাসন-দায়িত্ব ছিল 'উপরিক' বা 'উপরিক-মহারাজ'এর ওপর। অনেক সময় আবার রাজবংশের লোকদেরও 'উপরিক' নিযুক্ত করা হত। প্রাদেশিক শাসনকর্তারা সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হতেন; এবং এঁদের ওপর প্রদেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের দায়িত্ব থাকত। উপরিক প্রয়োজনবোধে অধস্তন কর্মচারী নিয়োগ করতে পারতেন।

জেলা-শাসন

প্রদেশের পরবর্তী প্রশাসনিক একক ছিল 'বিষয়'। প্রত্যেকটি প্রদেশ অনেকগুলো 'বিষয়', অর্থাৎ জেলায় বিভক্ত ছিল। এই (জেলাওয়ারী শাসনে গুপ্তসম্রাটরা কিছু নতুনত্ব এনেছিলেন।) গুপ্তসম্রাটরা মৌর্যদের মতো প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অতিকেন্দ্রীকরণে বিশ্বাসী ছিলেন না। প্রত্যেক জেলার নিজস্ব দপ্তর থাকত এবং স্থানীয় প্রশাসনের ওপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ তেমন কিছু ছিল না। জেলার শাসনভার ন্যস্ত থাকত 'বিষয়পতি'র ওপর। তিনি 'কুমারামাত্য' শ্রেণীর কর্মচারীদের মধ্যে থেকে নিযুক্ত হতেন। এই কুমারামাত্যরা অনেকটা ছিলেন আধুনিককালের 'এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার'দের মতো। বিষয়পতিরা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হলেও জেলা-প্রশাসন স্থানীয়ভাবেই পরিচালিত হত।

জেলা-পরিষদ

জেলা-প্রশাসনে জনসাধারণের বক্তব্যকে যে মর্যাদা দেওয়া হত তা জানা গিয়েছে 'পুরোগ' নামে জেলা-পরিষদের অস্তিত্ব থেকে। জেলা-পরিষদে প্রতিনিধিত্ব করতেনঃ মহাজনদের প্রতিনিধি, প্রধান ব্যবসায়ী, প্রধান কারিগর ও প্রধান লিপিকার বা করণিক। বিষয়পতি শাসনকার্য পরিচালনায় এঁদের মতামত ও পরামর্শ নিতেন। জেলা-পরিষদের সদস্যদের 'বিষয়-মহত্তার' বলা হত। বিষয়পতির নেতৃত্বে একদল কর্মচারী জেলার প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতেন।

গ্রাম-শাসন

(কতকগুলি গ্রামের সমষ্টি নিয়ে একটি জেলা (বা বিষয়) গড়ে উঠতো।) গ্রাম-শাসনের প্রধান দায়িত্ব ছিল গ্রামিক বা গ্রামাধ্যক্ষ নামে কর্মচারীদের ওপর। জেলা-প্রশাসনের ক্ষেত্রে যেমন, গ্রাম-শাসনের ব্যাপারেও তেমনি স্থানীয় সমস্যাগুলোর ওপরই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হত। গ্রামের বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি বা মোড়লদের একটি সভা, 'পঞ্চমণ্ডলী' বা 'গ্রামজনপদ', গ্রামিককে বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে শাসনকার্যে সহায়তা করত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, গুপ্ত-প্রশাসনে এই ধরনের সভা, সে গ্রামেরই

হোক আর জেলান্তরেরই হোক, বেসরকারীভাবেই গড়ে উঠতো, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কোনো নীতি হিসাবে নয়। মৌর্য আমলে কিন্তু সংস্থাগুলিকে সরকারই নিয়োগ করতেন।

নগর শাসন

নগরাঞ্চলের শাসন গ্রাম থেকে আলাদা হলেও মূলগত কোনো পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। 'পুরপাল' নামে নগর-প্রধানদের কুমারামাত্যদের মধ্য থেকেই নিয়োগ করা হত। 'পুরপাল'রা নগর-পরিষদের সাহায্যে নগর-প্রশাসন চালাতেন। নগর-পরিষদে বিভিন্ন পেশার মানুষ প্রতিনিধিত্ব করতেন। নগরের বাসিন্দারা যেসব সুযোগ-সুবিধা পেতে আগ্রহী হতেন নগর-পরিষদের সভ্যরা সেইসব ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। গুপ্ত আমলে অধিকাংশ নগর পাঁচিল-ঘেরা থাকত।

আইন ও বিচার-ব্যবস্থা

আইন ও বিচার-ব্যবস্থার যথাযথ বিকাশ সম্ভবতঃ গুপ্ত আমলেই ঘটেছিল। এই সময়ে অনেক আইন-গ্রন্থ রচিত হয় এবং সর্বপ্রথম দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন-কানুনের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। চুরি ও বলাৎকারকে ফৌজদারী আইনের, এবং সম্পত্তি-সংক্রান্ত বিরোধকে দেওয়ানী আইনের আওতায় আনা হয়েছিল। গুপ্তযুগের আইনগ্রন্থ রচয়িতাদের মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্য, নারদ, বৃহস্পতি ও কাত্যায়ন উল্লেখযোগ্য। কাত্যায়ন আইন ও বিচার-ব্যবস্থার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছিলেন। প্রচলিত রীতি-নীতি, আইনগ্রন্থ ও রাজার নির্দেশ ছিল বিচারের ভিত্তি। রাজ্যের সর্বোচ্চ বিচারপতি ছিলেন রাজা। অন্যান্য বিচারপতি, মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ, পুরোহিত প্রভৃতি রাজাকে বিচারকার্য সম্পাদনে সাহায্য করতেন। সরকারী আদালতগুলো প্রদেশ ও জেলায় অবস্থিত ছিল। গুপ্তযুগে সরকারী আদালত ব্যতীত গণ-আদালতের দৃষ্টান্তও বিরল নয়। কারিগর ও বণিকসঙ্ঘের নিজস্ব আদালত ছিল, যেখানে সংঘের সদস্যদের অপরাধের বিচার হত।

গণ-আদালত

তাছাড়া গ্রাম ও নগরের পঞ্চায়েৎ আদালতে ছোট-খাট দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচার হত; এবং অপরাধীকে সেই বিচারের রায় মানতে সরকারও বাধ্য করতেন। বলা বাহুল্য, গণ-আদালতগুলোতে ছোট-খাট মামলার নিষ্পত্তি হত বলে সরকারী আদালতে ভিড় কম হত। বিচার-ব্যবস্থার এই বিকেন্দ্রীকরণ তাই প্রশংসনীয়।

সামরিক সংগঠন

গুপ্তসাম্রাজ্যের সামরিক সংগঠন সম্পর্কে বিশেষ তথ্য জানা যায় নি। কোনো সূত্র থেকে সৈন্যবাহিনীর সংখ্যাও নিরূপণ করা সম্ভব হয় নি। গুপ্তসম্রাটরা সৈন্য-সামন্ত ও তাদের বাহন ঘোড়া ও হাতীর জন্য সামন্তরাজা ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের ওপরই মূলতঃ নির্ভর করতেন। তবে গুপ্তসম্রাটদের নিয়ন্ত্রণাধীন স্থায়ী সৈন্যবাহিনী যে ছিল মহাসেনাপতি, মহাদণ্ডনায়ক প্রভৃতি নাম থেকে তা সহজেই বোঝা যায়। মহাসেনাপতিদের নীচে ছিল মহাদণ্ডনায়ক নামে কর্মচারীদের স্থান। সৈন্য-বাহিনীকে তিনটি বাহিনীতে ভাগ করা হয়েছিল যেমনঃ পদাতিক, অশ্বারোহী ও হস্তীবাহিনী।

পুলিশ বাহিনী

দেশের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখবার জন্য পুলিশ বাহিনী মোতায়েন ছিল, তবে এবিষয়ে বিস্তারিত কোনো তথ্য এখনও পাওয়া যায় নি। বাসাড় (বৈশালী) সীলমোহর থেকে জানা যায় যে, 'দণ্ডপাশিক' নামে পুলিশ-প্রধান জেলান্তরে পুলিশ প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। সাধারণ পুলিশ 'চাট', 'ভাট' প্রভৃতি নামে অভিহিত হতেন।

বেতন ও রাজস্ব-প্রশাসন

গুপ্ত শাসন-ব্যবস্থায় কর্মচারীদের পারিশ্রমিক হিসাবে নগদ বেতন ও ভূমি দুই-ই দেওয়া হত। সামরিক কর্মচারীদের বেতন অর্থে দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। বেসামরিক কর্মচারীদের ক্ষেত্রে কারোকে দেওয়া হত নগদ অর্থ আবার অন্যকে জমি। ভূমি-রাজস্ব সরকারী আয়ের প্রধান উৎস হলেও ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য উপায়ে সরকারী অর্থাগমের পরিমাণ কম ছিল না। গুপ্ত আমলে নাকি জনসাধারণের কাছ থেকে আঠারো রকমের কর আদায় করা হত। কথাটি অতিরঞ্জিত হলেও পরোক্ষ কর বা বেগার খাটানো গুপ্ত আমলে অতি সাধারণ ব্যাপার ছিল। গ্রামের অধিবাসীরা রাজকীয় সৈন্যবাহিনী ও রাজকর্মচারীদের 'বিষ্টি' বা বিনাপারিশ্রমিকে শ্রমদান করতে বাধ্য হতেন।

শাসন-প্রকৃতি

শাসন-ব্যবস্থার উপরি-উক্ত বর্ণনা থেকে গুপ্তশাসনের প্রকৃতি কি ছিল তার পরিষ্কার চিত্রটি ফুটে ওঠে। প্রথমত, গুপ্ত শাসন-ব্যবস্থা অতিমাত্রায় কেন্দ্রীভূত শাসন ছিল না। অন্ততঃ জেলা ও গ্রাম স্তরে স্থানীয় শাসকরাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। কেন্দ্রীয় নির্দেশের সঙ্গে তার কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। দ্বিতীয়ত, গুপ্ত আমলাতন্ত্র ('ব্যুরোক্রেসী') মৌর্যদের মতো সম্প্রসারিত ছিল না, এদের সংখ্যা ছিল অপেক্ষাকৃত কম, যার ফলে একই ব্যক্তির হাতে অনেকগুলো দপ্তরের দায়িত্ব ন্যস্ত হত। তৃতীয়ত, গুপ্ত শাসন-ব্যবস্থায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ ছিল। জেলা, নগর বা গ্রাম শাসনের ক্ষেত্রে স্থানীয় সভাগুলোর যথেষ্ট মর্যাদা ছিল, যদিও এদের সদস্যরা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হতেন না। স্থানীয় সভাগুলো যেমন : জেলা-পরিষদ, নগর-পরিষদ

গণতান্ত্রিক উপাদান

প্রভৃতির সদস্যরা কিভাবে তাঁদের সদস্যপদ লাভ করতেন তা জানা যায় নি। তবে এঁদের একটা প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র যে ছিল তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। চতুর্থত, প্রাচীন ভারতে গুপ্তযুগেই সর্বপ্রথম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে স্থানীয় বিচারপতিরা সেই স্থানীয় অপরাধের বিচার করে সত্যাসত্য নিরূপণে সচেষ্ট হয়েছিলেন। পঞ্চমত, গুপ্ত শাসনব্যবস্থা ছিল সামন্ততান্ত্রিক, কারণ গুপ্তরা ব্রাহ্মণ, রাজকর্মচারী ও অন্যান্যদের বেতনের পরিবর্তে বা পুরস্কার হিসাবে যে ভূমিদান পদ্ধতি প্রচলিত করেন তা সামন্ততান্ত্রিক প্রবণতাকে উৎসাহিত করেছিল।

মৌর্য ও গুপ্ত শাসনের পার্থক্য

গুপ্ত শাসন-ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ইতিপূর্বে মৌর্যদের প্রবর্তিত শাসন-ব্যবস্থার সঙ্গে এর মূলগত কোনো প্রভেদ নেই। বরঞ্চ দুটি শাসন-ব্যবস্থার তুলনামূলক বিচার করলে একথা প্রতীয়মান হবে যে, গুপ্ত শাসন-ব্যবস্থা মৌর্য শাসন-ব্যবস্থার চূড়ান্ত পরিণতি মাত্র। তথাপি উভয় শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য যে ছিল না এমন নয়। প্রথমত, গুপ্তসম্রাটরা 'ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতা'য় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁরা নিজেদের ভগবান বিষ্ণুর মূর্ত প্রতীক বলে প্রচার করতেন। কিন্তু মৌর্যরা সম্রাটের ওপর দেবত্ব আরোপ করেন নি। দ্বিতীয়ত, গুপ্ত বিচার-ব্যবস্থায় দণ্ডবিধি মৌর্য আমলের মতো এত কঠোর ছিল না। তাছাড়া মৌর্য শাসন-ব্যবস্থার একটা মূল বৈশিষ্ট্য ছিল গুপ্তচর-প্রথা, কিন্তু গুপ্ত শাসন-ব্যবস্থায় ঐ ধরনের কোনো প্রথার অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায় নি। তৃতীয়ত, মৌর্যসম্রাটদের স্বৈরাচারী প্রবণতার প্রধান বাধা ছিল মন্ত্রিপরিষদ যার ক্ষমতা ছিল খুবই বেশী। কিন্তু গুপ্ত শাসনে মন্ত্রিপরিষদের তেমন কোনো ক্ষমতা ছিল না। গুপ্তরাজারা জেলা পর্যায়ে কুমারামাত্য উপাধিধারী

5

কর্মচারীদের ওপর কাজের দায়িত্ব দিয়েই নিশ্চিন্ত থাকতেন। কিন্তু মৌর্যদের ধারণা ছিল, নিম্নতম সরকারী কর্মচারীদের ওপরেও যথাযোগ্য নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন। (পঞ্চমত, মৌর্য আমলে কর্মচারীদের বেতন নগদ অর্থে দেওয়া হত, কিন্তু গুপ্ত রাজারা বেতন সব অর্থে দিতেন না, পরিবর্তে প্রায়ই জমি বা ভূমি দান করা হত।)

১০.১১. গুপ্ত শাসন-ব্যবস্থায় সামন্ততান্ত্রিক উপাদান : গুপ্তরাজারা যে শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন তা গোটা সাম্রাজ্যজুড়ে কার্যকরী ছিল না। কেবল গুপ্ত সম্রাটদের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন অঞ্চল যেমন: বাংলা, বিহার, উত্তর প্রদেশ ও মধ্য-প্রদেশের কতকগুলি এলাকায় ঐ শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। প্রত্যক্ষ শাসিত এলাকার বাইরে অনেক সামন্ত রাজার অস্তিত্ব ছিল, গুপ্তসম্রাটরা যাঁদের নামমাত্র আনুগত্য লাভ করেছিলেন। ঐসব এলাকার সামন্তরা গুপ্তরাজসভায় তাঁদের প্রতিনিধি পাঠাতেন, কর দান করতেন এবং বিবাহযোগ্যা কন্যা সম্রাটকে উপহার দিতেন। এইসব কর্তব্য পালনের পরিবর্তে সামন্তরা নিজ নিজ রাজ্যশাসন করবার অবাধ স্বাধীনতা গুপ্তসম্রাটের কাছ থেকে পেতেন। গুপ্তসাম্রাজ্যে এই ধরনের সামন্তরাজাদের অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে কেন্দ্রীয় রাজশক্তিকে দুর্বল করে রাজনৈতিক দিক দিয়ে রাষ্ট্রযন্ত্রকে সামন্ততন্ত্র অভিমুখী করে তুলেছিল।

সামন্তবর্গ

গুপ্তযুগে আরও একভাবে সামন্ততন্ত্রের বিকাশ ঘটেছিল। তা হল প্রশাসনিক কাজের জন্য রাজকর্মচারীদের এবং উপহারস্বরূপ ব্রাহ্মণদের গ্রাম বা ভূমিদান। গুপ্ত আমলে ব্রাহ্মণদের ভূমিদানের ব্যাপক প্রচলন ছিল। এইভাবে দান করা ভূমির শাসনকার্য পরিচালনা করতেন দান গ্রহীতা ব্রাহ্মণরা এবং সেই ভূমিতে বসবাসকারী কৃষকদের কাছ থেকে রাজস্বও আদায় করতেন তাঁরাই। বলা বাহুল্য, এইভাবে দান করা ভূমি বা গ্রাম কেন্দ্রীয় শক্তির নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেত। অনুরূপভাবে যে-সব রাজকর্মচারীকে নগদ বেতনের পরিবর্তে ভূমি দান করা হত সেই সব এলাকাও রাজশক্তির নিয়ন্ত্রণে আর থাকত না। গুপ্তযুগে এইভাবে রাজশক্তির যে বিকেন্দ্রীকরণ ঘটতে থাকে তা সামন্ততন্ত্র বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলা যেতে পারে।

গ্রাম বা ভূমিদান

১০.১২. গুপ্ত আমলে সামাজিক অবস্থা : (গুপ্ত যুগে সমাজে নানা উপবর্ণের সৃষ্টি হয়েছিল।) অবশ্য এই পরিবর্তন ইতিপূর্বেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। উপবর্ণের সৃষ্টি হয়েছিল দুইটি কারণে। প্রথমত, বৈদেশিক আক্রমণের সূত্রে যেসব বিদেশী এদেশে উপনীত হয়েছিল তাদের হিন্দুসমাজে জায়গা করে দেওয়ার তাগিদ। বিদেশীরা যোদ্ধৃ সম্প্রদায় ছিল বলে সমাজে তারা ক্ষত্রিয় হিসাবে স্থান লাভ করে। উপবর্ণের সংখ্যা বৃদ্ধির দ্বিতীয় কারণ হল, উপজাতির লোককে ভূমিদানের মাধ্যমে হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্তি। নানা উপজাতির মানুষ এক একটি উপবর্ণ হিসাবে সমাজে স্থান লাভ করেছিল। সমাজে নানা উপবর্ণের সৃষ্টি হওয়ার দরুন বর্ণ-প্রথারও ঈষৎ পরিবর্তন ঘটেছিল। এক বর্ণের মানুষের অন্য বর্ণের পেশা গ্রহণে তেমন কড়াকড়ি আর ছিল না। তবে অন্যান্য ক্ষেত্রে বর্ণপ্রথার যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছিল তেমন বলা যায় না।

নানা উপবর্ণের সৃষ্টি

(গুপ্তরাজাদের আধিপত্যের যুগে ব্রাহ্মণদের সামাজিক প্রতিপত্তি অক্ষুন্ন ছিল।/ গুপ্তরা মূলতঃ বৈশ্যবর্ণের হলেও ব্রাহ্মণদের কাছে তারা ক্ষত্রিয়দের মর্যাদা পেতেন। ব্রাহ্মণরা প্রচার

ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য

করতেন যে, গুপ্তসম্রাটরা এমন অনেক গুণের অধিকারী যা কেবল দেবতাদের মধ্যেই দৃষ্ট হয়। রাজার ওপর এই দেবত্ব আরোপের ফলে গুপ্তসম্রাটদের মর্যাদা অনেকখানি বেড়ে গিয়েছিল এবং তাঁরা ব্রাহ্মণদের একনিষ্ঠ সমর্থক হয়ে উঠেছিলেন। গুপ্তরাজাদের সমর্থনপুষ্ট ব্রাহ্মণরা ভূমিদান গ্রহণ করে বিত্তশালীও হয়ে ওঠেন।

শূদ্রদের মর্যাদা বৃদ্ধি

আলোচ্য সময়ে শূদ্রদের সামাজিক মর্যাদার খানিকটা উন্নতি হয়েছিল। ইতিপূর্বে শূদ্ররা গৃহভৃত্য, ক্রীতদাস ও কৃষি-শ্রমিক (agricultural labourer) হিসাবেই পরিগণিত হত আর তাদের কাজ ছিল তিনটি উঁচু বর্ণের মানুষের জন্য পরিশ্রম করা। কিন্তু এই সময় থেকে শূদ্রদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং তাঁরা কৃষিজীবি মানুষ হিসাবে বিবেচিত হতে থাকে। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ পাঠে তাদের অধিকার মেনে নেওয়া হয়। তাছাড়া তারা নতুন দেবতা কৃষ্ণের পূজারও অধিকারী হয়েছিল।

নারীদের মর্যাদা বৃদ্ধি

শূদ্রদের মতো নারীদের মর্যাদাও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পেয়েছিল, তবে সেই মর্যাদা কোনোভাবেই পুরুষের সমান ছিল না। উচ্চবর্ণের নারীরা শিক্ষার সীমিত সুযোগ পেতেন। সবচেয়ে বড় কথা হল, এই সময় থেকে এমন কতকগুলো প্রথা নারীদের ক্ষেত্রে প্রচলিত হয় যা নাকি পরবর্তীকালে নারীর মর্যাদাকে অনেকখানি ক্ষুণ্ণ করেছিল। এই প্রথাগুলি হল : বাল্যবিবাহ ও সহমরণ বা 'সতী'। এরাণ অঞ্চলে প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, স্বামীর চিতায় স্ত্রীর সহমরণে যাওয়ার প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে ৫২০ খ্রীস্টাব্দে।

চণ্ডালদের সংখ্যা বৃদ্ধি

গুপ্তদের সমসাময়িক যুগে চণ্ডাল বা অস্পৃশ্যদের সংখ্যা আগেকার তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। সমাজে চণ্ডালদের সংখ্যা এতই বেশী ছিল যে, বিদেশী ফা-হিয়েনের দৃষ্টিতেও তা এড়ায় নি। চণ্ডালরা লোকবসতির বাইরে বসবাস করতো এবং লোকালয়ে ঢোকবার আগে তারা শব্দ করে তাদের উপস্থিতি জানিয়ে দিত। কারণ চণ্ডালরা এতই অস্পৃশ্য ছিল যে তাদের ছায়া মাড়ালেও উচ্চবর্ণের মানুষ অপবিত্র হয়ে যেত। মোটামুটিভাবে এই ছিল গুপ্ত আমলের সমাজ-চিত্র।

সরকারী অর্থাগম

***১৩ ১৩ গুপ্ত যুগে ভারতীয় অর্থনীতি : ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প :** গুপ্তযুগে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কথা বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গিয়েছে। চীন দেশীয় পরিব্রাজকের বিবরণীতেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। এই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূলে ছিল কৃষি-উদ্বৃত্ত এবং শিল্প ও বাণিজ্য থেকে অর্থাগম। সরকারী আয়ের একটা বড় অংশ আসত ভূমি-রাজস্ব থেকে। তাছাড়া অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য থেকেও অর্থাগমের পরিমাণ কম ছিল না। আবার করদরাজ্যগুলো থেকেও একটা বড় অঙ্কের টাকা রাজকোষে জমা পড়তো।

কৃষিকাজ

গুপ্ত আমলে জমি নিবিড়ভাবে চাষ করা হত, কোনো জমিই অনাবাদী থাকতো না। সমসাময়িক শিলালিপিতে তাই দান করবার মতো জমির স্বল্পতার জন্য আক্ষেপ করা হয়েছে। কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে আখ, গম, ধান, বাজরা, পাট, তুলা, সরষে প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সরকারী মালিকানাভুক্ত জমিতে উৎপন্ন ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ রাজস্ব হিসাবে আদায় করা হত বলে কোনো কোনো সূত্রে বলা হয়েছে।

সমবায় সংঘের অগ্রণী ভূমিকা

শিল্পদ্রব্য

বিবেচ্য সময়ে সমবায় সংঘগুলোই শিল্পোৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করত। সমসাময়িক শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, কারিগর, ব্যবসায়ী, শ্রমজীবী মানুষ, এমনকি কুসীদজীবীদের (ব্যাঙ্কার) পৃথক সমবায় সংঘ ছিল। অনেক সময় বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত মানুষ যৌথভাবে সমবায় সংঘ গড়ে তুলতো। বৈশালীতে এই ধরনের একটি যুগ্ম সমবায় সংঘের অস্তিত্ব ছিল বলে জানা গিয়েছে। সমবায় সংঘগুলো ছিল স্বশাসিত সংস্থা ; এদের নিয়ম-কানুনও ছিল আলাদা। নিয়ম-কানুন লঙ্ঘন বা অপরাধ করলে সদস্যদের শাস্তির ব্যবস্থা করত সংঘই। বয়নশিল্প ছিল তখনকার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শিল্প। মালবের মান্দোসারে রেশম-শিল্পীদের সমবায় সংঘ ছিল। মসলিন, সুতীবস্ত্র, পশম-বস্ত্র ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হত। ধাতু-শিল্পের মধ্যে সোনা, রুপা, তামা, লোহা ও সীসা ছিল প্রধান। ভাস্কর্য শিল্প, হাতীর দাঁতের কাজ, জাহাজ-নির্মাণ প্রভৃতি শিল্পের যথেষ্ট প্রসার ছিল এবং এইসব শিল্পে হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হত।

বৈদেশিক বাণিজ্য

অর্থনৈতিক অবনতির সূচনা

বিদেশে ভারতীয় দ্রব্য-সামগ্রীর যথেষ্ট চাহিদা ছিল, সেই সূত্রে এদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতি ঘটেছিল ; আর তা থেকে প্রচুর অর্থাগমও হত। পশ্চিম উপকূলে ব্রোচ, চাওয়াল, কল্যাণ প্রভৃতি বন্দর থেকে পশ্চিম-এশীয় দেশগুলোর সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চলতো। দামী পাথর, মশলা, সিল্ক প্রভৃতি ছিল ভারত থেকে রপ্তানীর প্রধান প্রধান দ্রব্য। ভারত-রোম বাণিজ্যের প্রধান উপকরণ ছিল সিল্ক ও মশলা। আগে ভারত-রোম বাণিজ্য থেকে এদেশের ব্যবসায়ী ও সরকারের প্রচুর লাভ হত, কিন্তু ক্রমে ঐ বাণিজ্যে ভাঁটা পড়তে থাকে। কারণ হূন ও অন্যান্য বর্বরদের আক্রমণে রোমসাম্রাজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর ৪৭৬ খ্রীস্টাব্দে রোমের পতনের সময় থেকে ঐ ব্যবসা প্রায় সম্পূর্ণই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ঐ ব্যবসা বন্ধ হওয়ায় ভারতীয় ব্যবসায়ীরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যের দিকে ঝুঁকেছিল। পূর্ব-উপকূলের তাম্রলিপ্তি, কদুর, ঘণ্টশাল প্রভৃতি বন্দর থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ব্রহ্মদেশ, মালয় ও তৎসংলগ্ন দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা উপনীত হতেন। তবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির তেমন সহায়ক হয়েছিল বলে মনে হয় না।[১] কারণ গুপ্তযুগের শেষ দিকে নিকৃষ্ট মানের মুদ্রার প্রচলন পরোক্ষ-ভাবে অর্থনৈতিক অবনতির কথাই ঘোষণা করে। বাস্তবিকপক্ষে বৈদেশিক আক্রমণের সময় থেকে ভারতবর্ষের যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির যুগ শুরু হয়েছিল গুপ্তযুগ ছিল সেই উত্থানের শেষ অধ্যায়।

১৩.১৪. গুপ্তযুগে ভারতীয় সংস্কৃতির উৎকর্ষ : পণ্ডিত ব্যক্তিরা গুপ্তযুগকে ভারত-ইতিহাসের 'ক্ল্যাসিক্যাল এজ' বলে অভিহিত করেছেন। ইংরেজীতে 'ক্ল্যাসিক্যাল এজ' বলতে বোঝায় এমন একটি সময় যখন সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতিতে উৎকর্ষ সাধিত হয়।

---

[১] "There are indications that the coastal areas of India carried on trade with South-east Asia. But this had little impact on the internal economy of the country." Ancient India : p. 102 ; D. N. Jha.

'ক্লাসিক্যাল এজ'

একথা অনস্বীকার্য যে, গুপ্ত রাজাদের আমলে এমন কয়েকজন মনীষীর আবির্ভাব ঘটেছিল যাঁদের রচনায় সংস্কৃত সাহিত্য সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। তাছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ভারতীয় মনীষার চরম বিকাশ ঘটেছিল সেই আমলে। তখনকার শিল্পীরা স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় যে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন তার নিদর্শন আজও একেবারে লুপ্ত হয় নি। গুপ্তযুগে সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল গ্রীক ইতিহাসের 'পেরিক্লিস যুগে' তেমনি সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতিতে চরম গৌরবের দিন উপস্থিত হয়েছিল। অনুরূপভাবে ইংলন্ডের ইতিহাসে রাণী এলিজাবেথ-এর আমলেও সভ্যতা-সংস্কৃতির চরম বিকাশ ঘটেছিল। সেই কারণে কোনো কোনো ঐতিহাসিক গুপ্তযুগের সঙ্গে 'পেরিক্লিসের যুগ' ও 'এলিজাবেথের যুগে'র তুলনা করেছেন।

'পেরিক্লিস যুগ'

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য

গুপ্তযুগে সাহিত্যের ভাষা ছিল সংস্কৃত। সমাজের উঁচু স্তরের মানুষ সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করতো। আর নিম্নস্তরের মানুষের কথ্য ভাষা ছিল প্রাকৃত। যাই হোক, দীর্ঘদিন ধরে রাজানুগ্রহ লাভের ফলে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য পল্লবিত হয়েছিল। গুপ্তসম্রাটদের আনুকূল্যে এই ভাষায় নতুন শক্তি সঞ্চারিত হয়। তখনকার কাব্য ও সাহিত্য ব্যতীত শিলালিপি এমনকি, মুদ্রাতেও সংস্কৃত ভাষা ব্যবহৃত হত। হরিষেণের এলাহাবাদ প্রশস্তিটিও সংস্কৃত ভাষায় রচিত।

কালিদাস, শূদ্রক,
বিশাখদত্ত প্রমুখ

সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার ছিলেন কালিদাস। প্রবাদ আছে, তিনি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের নবরত্ন-সভার অন্যতম রত্ন ছিলেন। তাঁর কাব্য ও নাটকগুলির জনপ্রিয়তা আজও অক্ষুণ্ণ আছে। কালিদাসের অনন্যসাধারণ মহাকাব্য 'রঘুবংশে' দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সামরিক অভিযানের সামান্য ইঙ্গিত পাওয়া যায় ; আর 'কুমারসম্ভব' থেকে জানা যায় যে, গুপ্ত আমলে শিব-পূজার প্রচলন ছিল। কালিদাসের বিখ্যাত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' কে পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরাও বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটকের মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁর অপর দুটি রচনা হল 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' ও 'ঋতুসংহার'। কালিদাস ব্যতীত 'মৃচ্ছকটিকম্' নাটকের রচয়িতা শূদ্রক এবং ঐতিহাসিক নাটক 'মুদ্রারাক্ষস'-এর প্রণেতা বিশাখাদত্ত গুপ্তযুগেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। 'কীরাতার্জুনীয়ম্' গ্রন্থের রচয়িতা ভারবী এবং 'ভট্টিকাব্য' প্রণেতা ভট্টি সেই আমলেরই মানুষ ছিলেন।

পুরাণ ও মহাভারত

গুপ্তযুগে 'পুরাণ' বর্তমান রূপ লাভ করেছিল। পুরাণের উৎপত্তি হয়েছিল অনেক অনেক আগে যখন কবিরা ছিলেন এর রচয়িতা। কিন্তু এই সময়ে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা হিন্দু পূজা-পদ্ধতি ও আচার-ব্যবহার পুরাণ-এ সংযোজিত করেন, যার ফলে পুরাণ হিন্দুদের একটি শাস্ত্রগ্রন্থে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে মহাকবি ব্যাস অনেককাল আগে মহাভারত রচনা করলেও মূল রচনার সঙ্গে হাজার হাজার কবিতা এই সময় প্রক্ষিপ্ত হয়ে মহাকাব্যটি বর্তমান আকার ধারণ করেছিল। রামায়ণ যে আকারে আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে তারও চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হয় এই সময়।

একাধিক হিন্দু দার্শনিকের আবির্ভাবের ফলে নানা তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে ছয়টি দার্শনিক মতবাদ এই সময়েই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ছয়টি দর্শন হল ; ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য,

১০.১০ গুপ্তযুগের শাসন-পদ্ধতি : বৈশিষ্ট্য এবং মৌর্য শাসন-পদ্ধতির সঙ্গে তার প্রভেদ : নানা সূত্র থেকে গুপ্ত শাসন-পদ্ধতি সম্পর্কে জানা সম্ভব হয়েছে যেমন : ফা-হিয়েনের বিবরণ, হরিষেণের এলাহাবাদ প্রশস্তি এবং গুপ্তসাম্রাজ্যভুক্ত বিভিন্ন অঞ্চলে আবিষ্কৃত লেখমালা। প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে, গুপ্ত আমলে গণরাজ্যগুলির বিলুপ্তি ঘটেছিল। চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত যেসব গণরাজ্য নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পেরেছিল গুপ্ত আমলে সেগুলোর বিলুপ্তি ঘটে। লিচ্ছবী গণরাজ্যের কুমারদেবীকে গুপ্ত-সম্রাট বিবাহ করেছিলেন বলে রাজ্যটি গুপ্তসাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন বা রাজ্যজয়ের ফলেই সম্ভবতঃ গণরাজ্যগুলোর অবসান ঘটে থাকবে।

গণরাজ্যগুলোর বিলুপ্তি

গুপ্ত শাসন-ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল রাজার ওপর দেবত্ব আরোপ। গুপ্ত-সম্রাটরা 'পরমদৈবত' বা সমতুল্য উপাধি গ্রহণ করতেন। ইতিপূর্বে শক-কুষাণ আমল থেকেই তা শুরু হয়ে গিয়েছিল, তবে গুপ্তদের আমলে রাজার দেবত্ব আরও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। গুপ্তসম্রাটরা ব্রাহ্মণদের উদার হাতে দান করতেন, আর তার প্রতিদানে ব্রাহ্মণরা রাজাকে বিভিন্ন দেবতার সঙ্গে তুলনা করে প্রজাদের আনুগত্যলাভে সম্রাটকে সাহায্য করতেন। ব্রাহ্মণরা অনুশাসন দিয়েছিলেন যে, গুপ্তসম্রাটরা মর্ত্যলোকে আবির্ভূত দেবতা বিষ্ণু।

রাজার ওপর দেবত্ব আরোপ

গুপ্তসাম্রাজ্যে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। গুপ্তরাজারা বংশানুক্রমিকভাবে রাজত্ব করতেন। সাধারণতঃ রাজা জ্যেষ্ঠপুত্রকেই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করতেন, তবে যোগ্য ব্যক্তিকে সিংহাসনে স্থাপন করবার প্রয়োজনে তার ব্যতিক্রম যে হত না তা নয়। রাজা বা সম্রাট ছিলেন গুপ্তসাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি। তবে তিনি স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। রাজকার্য পরিচালনায় তিনি একাধিক মন্ত্রী ও রাজকর্মচারীর সাহায্য নিতেন। তাছাড়া যুবরাজ ও অপরাপর রাজপুত্ররা এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করতেন।

রাজতন্ত্র ও রাজা

শাসনকার্য পরিচালনার ব্যাপারে গুপ্তসম্রাট রাজকর্মচারীদের সাহায্য নিতেন। গুপ্ত শাসন-ব্যবস্থায় আমলাতান্ত্রিক প্রাধান্য থাকলেও মৌর্য আমলের মতো তা এত ব্যাপক ও জটিল

আমলাতন্ত্র

কেন্দ্রীয় শাসন

ছিল না। মৌর্যদের মতো গুপ্তসম্রাটরাও শাসনব্যবস্থাকে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পর্যায়ে ভাগ করেছিলেন। তবে রাজা বা সম্রাটকে শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে পরামর্শ দেবার জন্য কোনো মন্ত্রিপরিষদের অস্তিত্ব ছিল কি না তা সঠিকভাবে জানা যায় নি। 'মন্ত্রী'রা ছিলেন সর্বোচ্চ রাজকর্মচারী। অপরাপর উচ্চ রাজকর্মচারীদের মধ্যে 'মহাবলাধিকৃত' (প্রধান সেনাপতি), 'মহাদণ্ডনায়ক' (সেনাপতি) ও 'মহাপ্রতিহার' (প্রধান দ্বাররক্ষী বা প্রাসাদরক্ষী) ও 'সন্ধিবিগ্রহিকা' (পররাষ্ট্রমন্ত্রী বা যুদ্ধ ও শান্তির মন্ত্রী) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অপর এক শ্রেণীর কর্মচারী যাঁরা গুপ্ত শাসন-ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন তাঁরা 'কুমারামাত্য'। কুমারামাত্য ও আযুক্ত নামে কর্মচারীরা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসনের মধ্যে যোগসূত্র বজায় রাখতেন।

প্রাদেশিক শাসন

শানসকার্যের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য গোটা সাম্রাজ্যকে অনেকগুলো প্রদেশে বিভক্ত করা হয়েছিল। সেই আমলে প্রদেশের নাম ছিল 'দেশ' বা 'ভুক্তি' যেমন: অহিচ্ছত্র-ভুক্তি, শ্রাবস্তীভুক্তি, মুকুলিদেশ প্রভৃতি। প্রদেশের শাসন-দায়িত্ব ছিল 'উপরিক' বা 'উপরিক-মহারাজ'এর ওপর। অনেক সময় আবার রাজবংশের লোকদেরও 'উপরিক' নিযুক্ত করা হত। প্রাদেশিক শাসনকর্তারা সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হতেন; এবং এঁদের ওপর প্রদেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের দায়িত্ব থাকত। উপরিক প্রয়োজনবোধে অধস্তন কর্মচারী নিয়োগ করতে পারতেন।

জেলা-শাসন

প্রদেশের পরবর্তী প্রশাসনিক একক ছিল 'বিষয়'। প্রত্যেকটি প্রদেশ অনেকগুলো 'বিষয়', অর্থাৎ জেলায় বিভক্ত ছিল। এই জেলাওয়ারী শাসনে গুপ্তসম্রাটরা কিছু নতুনত্ব এনেছিলেন। গুপ্তসম্রাটরা মৌর্যদের মতো প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অতিকেন্দ্রীকরণে বিশ্বাসী ছিলেন না। প্রত্যেক জেলার নিজস্ব দপ্তর থাকত এবং স্থানীয় প্রশাসনের ওপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ তেমন কিছু ছিল না। জেলার শাসনভার ন্যস্ত থাকত 'বিষয়পতি'র ওপর। তিনি 'কুমারামাত্য' শ্রেণীর কর্মচারীদের মধ্যে থেকে নিযুক্ত হতেন। এই কুমারামাত্যরা অনেকটা ছিলেন আধুনিককালের 'এ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটিভ অফিসার'দের মতো। বিষয়পতিরা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হলেও জেলা-প্রশাসন স্থানীয়ভাবেই পরিচালিত হত। জেলা-প্রশাসনে জনসাধারণের বক্তব্যকে যে মর্যাদা দেওয়া হত তা জানা গিয়েছে 'পুরোগ' নামে জেলা-পরিষদের অস্তিত্ব থেকে।

জেলা-পরিষদ

জেলা-পরিষদে প্রতিনিধিত্ব করতেন: মহাজনদের প্রতিনিধি, প্রধান ব্যবসায়ী, প্রধান কারিগর ও প্রধান লিপিকার বা করণিক। বিষয়পতি শাসনকার্য পরিচালনায় এঁদের মতামত ও পরামর্শ নিতেন। জেলা-পরিষদের সদস্যদের 'বিষয়-মহাত্তর' বলা হত। বিষয়পতির নেতৃত্বে একদল কর্মচারী জেলার প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতেন।

গ্রাম-শাসন

কতকগুলি গ্রামের সমষ্টি নিয়ে একটি জেলা (বা বিষয়) গড়ে উঠতো। গ্রাম-শাসনের প্রধান দায়িত্ব ছিল গ্রামিক বা গ্রামাধ্যক্ষ নামে কর্মচারীদের ওপর। জেলা-প্রশাসনের ক্ষেত্রে যেমন, গ্রাম-শাসনের ব্যাপারেও তেমনি স্থানীয় সমস্যাগুলোর ওপরই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হত। গ্রামের বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি বা মোড়লদের একটি সভা, 'পঞ্চমণ্ডলী' বা 'গ্রামজনপদ', গ্রামিককে বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে শাসনকার্যে সহায়তা করত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, গুপ্ত-প্রশাসনে এই ধরনের সভা, সে গ্রামেরই

হোক আর জেলাস্তরেরই হোক, বেসরকারীভাবেই গড়ে উঠতো, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কোনো নীতি হিসাবে নয়। মৌর্য আমলে কিন্তু সংস্থাগুলিকে সরকারই নিয়োগ করতেন।

নগর শাসন

(নগরাঞ্চলের শাসন গ্রাম থেমে আলাদা হলেও মূলগত কোনো পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না।) 'পুরপাল' নামে নগর-প্রধানদের কুমারামাত্যদের মধ্য থেকেই নিয়োগ করা হত। 'পুরপাল'রা নগর-পরিষদের সাহায্যে নগর-প্রশাসন চালাতেন। নগর-পরিষদে বিভিন্ন পেশার মানুষ প্রতিনিধিত্ব করতেন। নগরের বাসিন্দারা যেসব সুযোগ-সুবিধা পেতে আগ্রহী হতেন নগর-পরিষদের সভ্যরা সেইসব ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। গুপ্ত আমলে অধিকাংশ নগর পাঁচিল-ঘেরা থাকত।

আইন ও বিচার-ব্যবস্থা

(আইন ও বিচার-ব্যবস্থার যথাযথ বিকাশ সম্ভবতঃ গুপ্ত আমলেই ঘটেছিল। এই সময়ে অনেক আইন-গ্রন্থ রচিত হয় এবং সর্বপ্রথম দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন-কানুনের মধ্যে পার্থক্য করা হয়।) চুরি ও বলাৎকারকে ফৌজদারী আইনের, এবং সম্পত্তি-সংক্রান্ত বিরোধকে দেওয়ানী আইনের আওতায় আনা হয়েছিল। গুপ্তযুগের আইনগ্রন্থ রচয়িতাদের মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্য, নারদ, বৃহস্পতি ও কাত্যায়ন উল্লেখযোগ্য। কাত্যায়ন আইন ও বিচার-ব্যবস্থার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছিলেন। প্রচলিত রীতি-নীতি, আইনগ্রন্থ ও রাজার নির্দেশ ছিল বিচারের ভিত্তি। রাজ্যের সর্বোচ্চ বিচারপতি ছিলেন রাজা। অন্যান্য বিচারপতি, মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ, পুরোহিত প্রভৃতি রাজাকে বিচারকার্য সম্পাদনে সাহায্য করতেন। (সরকারী আদালতগুলো প্রদেশ ও জেলায় অবস্থিত ছিল। গুপ্তযুগে সরকারী আদালত ব্যতীত গণ-আদালতের দৃষ্টান্তও বিরল নয়। কারিগর ও বণিকসঙ্ঘের নিজস্ব আদালত ছিল, যেখানে সঙ্ঘের সদস্যদের অপরাধের বিচার হত।)

গণ-আদালত

তাছাড়া গ্রাম ও নগরের পঞ্চায়েৎ আদালতে ছোট-খাট দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচার হত; এবং অপরাধীকে সেই বিচারের রায় মানতে সরকারও বাধ্য করতেন। বলা বাহুল্য, গণ-আদালতগুলোতে ছোট-খাট মামলার নিষ্পত্তি হত বলে সরকারী আদালতে ভিড় কম হত। বিচার-ব্যবস্থার এই বিকেন্দ্রীকরণ তাই প্রশংসনীয়।

সামরিক সংগঠন

(গুপ্তসাম্রাজ্যের সামরিক সংগঠন সম্পর্কে বিশেষ তথ্য জানা যায় নি। কোনো সূত্র থেকে সৈন্যবাহিনীর সংখ্যাও নিরূপণ করা সম্ভব হয় নি। গুপ্তসম্রাটরা সৈন্য-সামন্ত ও তাদের বাহন ঘোড়া ও হাতীর জন্য সামন্তরাজা ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের ওপরই মূলতঃ নির্ভর করতেন। তবে গুপ্তসম্রাটদের নিয়ন্ত্রণাধীন স্থায়ী সৈন্যবাহিনী যে ছিল মহাসেনাপতি, মহাদণ্ডনায়ক প্রভৃতি নাম থেকে তা সহজেই বোঝা যায়। মহাসেনাপতিদের নীচে ছিল মহাদণ্ডনায়ক নামে কর্মচারীদের স্থান। সৈন্য-বাহিনীকে তিনটি বাহিনীতে ভাগ করা হয়েছিল যেমনঃ পদাতিক, অশ্বারোহী ও হস্তীবাহিনী।

পুলিশ বাহিনী

দেশের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখবার জন্য পুলিশ বাহিনী মোতায়েন ছিল,) তবে এবিষয়ে বিস্তারিত কোনো তথ্য এখনও পাওয়া যায় নি। বাসাড় (বৈশালী) সীলমোহর থেকে জানা যায় যে, 'দণ্ডপাশিক' নামে পুলিশ-প্রধান জেলাস্তরে পুলিশ প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। সাধারণ পুলিশ 'চাট', 'ভাট' প্রভৃতি নামে অভিহিত হতেন।

4

বেতন ও রাজস্ব-প্রশাসন

গুপ্ত শাসন-ব্যবস্থায় কর্মচারীদের পারিশ্রমিক হিসাবে নগদ বেতন ও ভূমি দুই-ই দেওয়া হত। সামরিক কর্মচারীদের বেতন অর্থে দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। বেসামরিক কর্মচারীদের ক্ষেত্রে কারোকে দেওয়া হত নগদ অর্থ আবার অন্যকে জমি। ভূমি-রাজস্ব সরকারী আয়ের প্রধান উৎস হলেও ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য উপায়ে সরকারী অর্থাগমের পরিমাণ কম ছিল না। গুপ্ত আমলে নাকি জনসাধারণের কাছ থেকে আঠারো রকমের কর আদায় করা হত। কথাটি অতিরঞ্জিত হলেও পরোক্ষ কর বা বেগার খাটানো গুপ্ত আমলে অতি সাধারণ ব্যাপার ছিল। গ্রামের অধিবাসীরা রাজকীয় সৈন্যবাহিনী ও রাজকর্মচারীদের 'বিষ্টি' বা বিনাপারিশ্রমিকে শ্রমদান করতে বাধ্য হতেন।

শাসন-প্রকৃতি

গণতান্ত্রিক উপাদান

শাসন-ব্যবস্থার উপরি-উক্ত বর্ণনা থেকে গুপ্তশাসনের প্রকৃতি কি ছিল তার পরিষ্কার চিত্রটি ফুটে ওঠে। প্রথমত, গুপ্ত শাসন-ব্যবস্থা অতিমাত্রায় কেন্দ্রীভূত শাসন ছিল না। অন্ততঃ জেলা ও গ্রাম স্তরে স্থানীয় শাসকরাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। কেন্দ্রীয় নির্দেশের সঙ্গে তার কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। দ্বিতীয়ত, গুপ্ত আমলাতন্ত্র ('ব্যুরোক্রেসী') মৌর্যদের মতো সম্প্রসারিত ছিল না, এদের সংখ্যা ছিল অপেক্ষাকৃত কম, যার ফলে একই ব্যক্তির হাতে অনেকগুলো দপ্তরের দায়িত্ব ন্যস্ত হত। তৃতীয়ত, গুপ্ত শাসন-ব্যবস্থায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ ছিল। জেলা, নগর বা গ্রাম শাসনের ক্ষেত্রে স্থানীয় সভাগুলোর যথেষ্ট মর্যাদা ছিল, যদিও এদের সদস্যরা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হতেন না। স্থানীয় সভাগুলো যেমন ঃ জেলা-পরিষদ, নগর-পরিষদ প্রভৃতির সদস্যরা কিভাবে তাঁদের সদস্যপদ লাভ করতেন তা জানা যায় নি। তবে এঁদের একটা প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র যে ছিল তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। চতুর্থত, প্রাচীন ভারতে গুপ্তযুগেই সর্বপ্রথম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে স্থানীয় বিচারপতিরা সেই স্থানীয় অপরাধের বিচার করে সত্যাসত্য নিরূপণে সচেষ্ট হয়েছিলেন। পঞ্চমত, গুপ্ত শাসনব্যবস্থা ছিল সামন্ততান্ত্রিক, কারণ গুপ্তরা ব্রাহ্মণ, রাজকর্মচারী ও অন্যান্যদের বেতনের পরিবর্তে বা পুরস্কার হিসাবে যে ভূমিদান পদ্ধতি প্রচলিত করেন তা সামন্ততান্ত্রিক প্রবণতাকে উৎসাহিত করেছিল।

মৌর্য ও গুপ্ত শাসনের পার্থক্য

গুপ্ত শাসন-ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ইতিপূর্বে মৌর্যদের প্রবর্তিত শাসন-ব্যবস্থার সঙ্গে এর মূলগত কোনো প্রভেদ নেই। বরঞ্চ দুটি শাসন-ব্যবস্থার তুলনামূলক বিচার করলে একথা প্রতীয়মান হবে যে, গুপ্ত শাসন-ব্যবস্থা মৌর্য শাসন-ব্যবস্থার চূড়ান্ত পরিণতি মাত্র। তথাপি উভয় শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য যে ছিল না এমন নয়। প্রথমত, গুপ্তসম্রাটরা 'ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতা'য় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁরা নিজেদের ভগবান বিষ্ণুর মূর্ত প্রতীক বলে প্রচার করতেন। কিন্তু মৌর্যরা সম্রাটের ওপর দেবত্ব আরোপ করেন নি। দ্বিতীয়ত, গুপ্ত বিচার-ব্যবস্থায় দণ্ডবিধি মৌর্য আমলের মতো এত কঠোর ছিল না। তাছাড়া মৌর্য শাসন-ব্যবস্থার একটা মূল বৈশিষ্ট্য ছিল গুপ্তচর-প্রথা, কিন্তু গুপ্ত শাসন-ব্যবস্থায় ঐ ধরনের কোনো প্রথার অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায় নি। তৃতীয়ত, মৌর্যসম্রাটদের স্বৈরাচারী প্রবণতার প্রধান বাধা ছিল মন্ত্রিপরিষদ যার ক্ষমতা ছিল খুবই বেশী। কিন্তু গুপ্ত শাসনে মন্ত্রিপরিষদের তেমন কোনো ক্ষমতা ছিল না। গুপ্তরাজারা জেলা পর্যায়ে কুমারামাত্য উপাধিধারী

কর্মচারীদের ওপর কাজের দায়িত্ব দিয়েই নিশ্চিন্ত থাকতেন। কিন্তু মৌর্যদের ধারণা ছিল, নিম্নতম সরকারী কর্মচারীদের ওপরেও যথাযোগ্য নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন। (পঞ্চমত, মৌর্য আমলে কর্মচারীদের বেতন নগদ অর্থে দেওয়া হত, কিন্তু গুপ্ত রাজারা বেতন সব অর্থে দিতেন না, পরিবর্তে প্রায়ই জমি বা ভূমি দান করা হত।)

১০.১১. গুপ্ত শাসন-ব্যবস্থায় সামন্ততান্ত্রিক উপাদান : গুপ্তরাজারা যে শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন তা গোটা সাম্রাজ্যজুড়ে কার্যকরী ছিল না। কেবল গুপ্ত সম্রাটদের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন অঞ্চল যেমন : বাংলা, বিহার, উত্তর প্রদেশ ও মধ্য-প্রদেশের কতকগুলি এলাকায় ঐ শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। প্রত্যক্ষ শাসিত এলাকার বাইরে অনেক

সামন্তবর্গ

সামন্ত রাজার অস্তিত্ব ছিল, গুপ্তসম্রাটরা যাঁদের নামমাত্র আনুগত্য লাভ করেছিলেন। ঐসব এলাকার সামন্তরা গুপ্তরাজসভায় তাঁদের প্রতিনিধি পাঠাতেন, কর দান করতেন এবং বিবাহযোগ্যা কন্যা সম্রাটকে উপহার দিতেন। এইসব কর্তব্য পালনের পরিবর্তে সামন্তরা নিজ নিজ রাজ্যশাসন করবার অবাধ স্বাধীনতা গুপ্তসম্রাটের কাছ থেকে পেতেন। গুপ্তসাম্রাজ্যে এই ধরনের সামন্তরাজাদের অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে কেন্দ্রীয় রাজশক্তিকে দুর্বল করে রাজনৈতিক দিক দিয়ে রাষ্ট্রযন্ত্রকে সামন্ততন্ত্র অভিমুখী করে তুলেছিল।

গুপ্তযুগে আরও একভাবে সামন্ততন্ত্রের বিকাশ ঘটেছিল। তা হল প্রশাসনিক কাজের জন্য রাজকর্মচারীদের এবং উপহারস্বরূপ ব্রাহ্মণদের গ্রাম বা ভূমিদান। গুপ্ত আমলে ব্রাহ্মণদের ভূমিদানের ব্যাপক প্রচলন ছিল। এইভাবে দান করা ভূমির শাসনকার্য

গ্রাম বা ভূমিদান

পরিচালনা করতেন দান গ্রহীতা ব্রাহ্মণরা এবং সেই ভূমিতে বসবাসকারী কৃষকদের কাছ থেকে রাজস্বও আদায় করতেন তাঁরাই। বলা বাহুল্য, এইভাবে দান করা ভূমি বা গ্রাম কেন্দ্রীয় শক্তির নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেত। অনুরূপভাবে যে-সব রাজকর্মচারীকে নগদ বেতনের পরিবর্তে ভূমি দান করা হত সেই সব এলাকাও রাজশক্তির নিয়ন্ত্রণে আর থাকত না। গুপ্তযুগে এইভাবে রাজশক্তির যে বিকেন্দ্রীকরণ ঘটতে থাকে তা সামন্ততন্ত্র বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলা যেতে পারে।

১০.১২. গুপ্ত আমলে সামাজিক অবস্থা : (গুপ্ত যুগে সমাজে নানা উপবর্ণের সৃষ্টি হয়েছিল।) অবশ্য এই পরিবর্তন ইতিপূর্বেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। উপবর্ণের সৃষ্টি হয়েছিল দুইটি কারণে। প্রথমত, বৈদেশিক আক্রমণের সূত্রে যেসব বিদেশী এদেশে উপনীত হয়েছিল তাদের হিন্দুসমাজে জায়গা করে দেওয়ার তাগিদ। বিদেশীরা যোদ্ধৃ সম্প্রদায় ছিল বলে সমাজে তারা ক্ষত্রিয় হিসাবে স্থান লাভ করে। উপবর্ণের

নানা উপবর্ণের সৃষ্টি

সংখ্যা বৃদ্ধির দ্বিতীয় কারণ হল, উপজাতির লোককে ভূমিদানের মাধ্যমে হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্তি। নানা উপজাতির মানুষ এক একটি উপবর্ণ হিসাবে সমাজে স্থান লাভ করেছিল। সমাজে নানা উপবর্ণের সৃষ্টি হওয়ার দরুন বর্ণ-প্রথারও ঈষৎ পরিবর্তন ঘটেছিল। এক বর্ণের মানুষের অন্য বর্ণের পেশা গ্রহণে তেমন কড়াকড়ি আর ছিল না। তবে অন্যান্য ক্ষেত্রে বর্ণপ্রথার যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছিল তেমন বলা যায় না।

(গুপ্তরাজাদের আধিপত্যের যুগে ব্রাহ্মণদের সামাজিক প্রতিপত্তি অক্ষুন্ন ছিল। গুপ্তরা মূলতঃ বৈশ্যবর্ণের হলেও ব্রাহ্মণদের কাছে তারা ক্ষত্রিয়দের মর্যাদা পেতেন। ব্রাহ্মণরা প্রচার

6

ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য

করতেন যে, গুপ্তসম্রাটরা এমন অনেক গুণের অধিকারী যা কেবল দেবতাদের মধ্যেই দৃষ্ট হয়। রাজার ওপর এই দেবত্ব আরোপের ফলে গুপ্তসম্রাটদের মর্যাদা অনেকখানি বেড়ে গিয়েছিল এবং তাঁরা ব্রাহ্মণদের একনিষ্ঠ সমর্থক হয়ে উঠেছিলেন। গুপ্তরাজাদের সমর্থনপুষ্ট ব্রাহ্মণরা ভূমিদান গ্রহণ করে বিত্তশালীও হয়ে ওঠেন।

শূদ্রদের মর্যাদা বৃদ্ধি

আলোচ্য সময়ে শূদ্রদের সামাজিক মর্যাদার খানিকটা উন্নতি হয়েছিল। ইতিপূর্বে শূদ্ররা গৃহভৃত্য, ক্রীতদাস ও কৃষি-শ্রমিক (agricultural labourer) হিসাবেই পরিগণিত হত আর তাদের কাজ ছিল তিনটি উঁচু বর্ণের মানুষের জন্য পরিশ্রম করা। কিন্তু এই সময় থেকে শূদ্রদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং তাঁরা কৃষিজীবি মানুষ হিসাবে বিবেচিত হতে থাকে। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ পাঠে তাদের অধিকার মেনে নেওয়া হয়। তাছাড়া তারা নতুন দেবতা কৃষ্ণের পূজারও অধিকারী হয়েছিল।

নারীদের মর্যাদা বৃদ্ধি

শূদ্রদের মতো নারীদের মর্যাদাও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পেয়েছিল. তবে সেই মর্যাদা কোনোভাবেই পুরুষের সমান ছিল না। উচ্চবর্ণের নারীরা শিক্ষার সীমিত সুযোগ পেতেন। সবচেয়ে বড় কথা হল, এই সময় থেকে এমন কতকগুলো প্রথা নারীদের ক্ষেত্রে প্রচলিত হয় যা নাকি পরবর্তীকালে নারীর মর্যাদাকে অনেকখানি ক্ষুণ্ণ করেছিল। এই প্রথাগুলি হল ঃ বাল্যবিবাহ ও সহমরণ বা 'সতী'। এরাণ অঞ্চলে প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, স্বামীর চিতায় স্ত্রীর সহমরণে যাওয়ার প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে ৫২০ খ্রীস্টাব্দে।

চণ্ডালদের সংখ্যা বৃদ্ধি

গুপ্তদের সমসাময়িক যুগে চণ্ডাল বা অস্পৃশ্যদের সংখ্যা আগেকার তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। সমাজে চণ্ডালদের সংখ্যা এতই বেশী ছিল যে, বিদেশী ফা-হিয়েনের দৃষ্টিতেও তা এড়ায় নি। চণ্ডালরা লোকবসতির বাইরে বসবাস করতো এবং লোকালয়ে ঢোকবার আগে তারা শব্দ করে তাদের উপস্থিতি জানিয়ে দিত। কারণ চণ্ডালরা এতই অস্পৃশ্য ছিল যে তাদের ছায়া মাড়ালেও উচ্চবর্ণের মানুষ অপবিত্র হয়ে যেত। মোটামুটিভাবে এই ছিল গুপ্ত আমলের সমাজ-চিত্র।

সরকারী অর্থাগম

***১৩.১৩ গুপ্ত যুগে ভারতীয় অর্থনীতি ঃ ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প ঃ** গুপ্তযুগে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কথা বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গিয়েছে। চীন দেশীয় পরিব্রাজকের বিবরণীতেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। এই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূলে ছিল কৃষি-উদ্‌বৃত্ত এবং শিল্প ও বাণিজ্য থেকে অর্থাগম। সরকারী আয়ের একটা বড় অংশ আসত ভূমি-রাজস্ব থেকে। তাছাড়া অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য থেকেও অর্থাগমের পরিমাণ কম ছিল না। আবার করদরাজ্যগুলো থেকেও একটা বড় অঙ্কের টাকা রাজকোষে জমা পড়তো।

কৃষিকাজ

গুপ্ত আমলে জমি নিবিড়ভাবে চাষ করা হত, কোনো জমিই অনাবাদী থাকতো না। সমসাময়িক শিলালিপিতে তাই দান করবার মতো জমির স্বল্পতার জন্য আক্ষেপ করা হয়েছে। কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে আখ, গম, ধান, বাজরা, পাট, তুলা, সরষে প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সরকারী মালিকানাভুক্ত জমিতে উৎপন্ন ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ রাজস্ব হিসাবে আদায় করা হত বলে কোনো কোনো সূত্রে বলা হয়েছে।

সমবায় সংঘের অগ্রণী ভূমিকা

বিবেচ্য সময়ে সমবায় সংঘগুলোই শিল্পোৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করত। সমসাময়িক শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, কারিগর, ব্যবসায়ী, শ্রমজীবী মানুষ, এমনকি কুসীদজীবীদের (ব্যাঙ্কার) পৃথক সমবায় সংঘ ছিল। অনেক সময় বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত মানুষ যৌথভাবে সমবায় সংঘ গড়ে তুলতো। বৈশালীতে এই ধরনের একটি যুগ্ম সমবায় সংঘের অস্তিত্ব ছিল বলে জানা গিয়েছে। সমবায় সংঘগুলো ছিল স্বশাসিত সংস্থা ; এদের নিয়ম-কানুনও ছিল আলাদা। নিয়ম-কানুন লঙ্ঘন বা অপরাধ করলে সদস্যদের শাস্তির ব্যবস্থা করত সংঘই। বয়নশিল্প ছিল তখনকার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শিল্প। মালবের মান্দোসারে রেশম-শিল্পীদের সমবায় সংঘ ছিল। মসলিন, সুতীবস্ত্র, পশম-বস্ত্র ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হত। ধাতু-শিল্পের মধ্যে সোনা, রুপা, তামা, লোহা ও সীসা ছিল প্রধান। ভাস্কর্য শিল্প, হাতীর দাঁতের কাজ, জাহাজ-নির্মাণ প্রভৃতি শিল্পের যথেষ্ট প্রসার ছিল এবং এইসব শিল্পে হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হত।

শিল্পদ্রব্য

বৈদেশিক বাণিজ্য

বিদেশে ভারতীয় দ্রব্য-সামগ্রীর যথেষ্ট চাহিদা ছিল, সেই সূত্রে এদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতি ঘটেছিল ; আর তা থেকে প্রচুর অর্থাগমও হত। পশ্চিম উপকূলে ব্রোচ, চাওয়াল, কল্যাণ প্রভৃতি বন্দর থেকে পশ্চিম-এশীয় দেশগুলোর সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চলতো। দামী পাথর, মশলা, সিল্ক প্রভৃতি ছিল ভারত থেকে রপ্তানীর প্রধান প্রধান দ্রব্য। ভারত-রোম বাণিজ্যের প্রধান উপকরণ ছিল সিল্ক ও মশলা। আগে ভারত-রোম বাণিজ্য থেকে এদেশের ব্যবসায়ী ও সরকারের প্রচুর লাভ হত, কিন্তু ক্রমে ঐ বাণিজ্যে ভাঁটা পড়তে থাকে। কারণ হূন ও অন্যান্য বর্বরদের আক্রমণে রোমসাম্রাজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর ৪৭৬ খ্রীস্টাব্দে রোমের পতনের সময় থেকে ঐ ব্যবসা প্রায় সম্পূর্ণই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ঐ ব্যবসা বন্ধ হওয়ায় ভারতীয় ব্যবসায়ীরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যের দিকে ঝুঁকেছিল। পূর্ব-উপকূলের তাম্রলিপ্তি, কদুর, ঘণ্টশাল প্রভৃতি বন্দর থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ব্রহ্মদেশ, মালয় ও তৎসংলগ্ন দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা উপনীত হতেন। তবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির তেমন সহায়ক হয়েছিল বলে মনে হয় না।[১] কারণ গুপ্তযুগের শেষ দিকে নিকৃষ্ট মানের মুদ্রার প্রচলন পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক অবনতির কথাই ঘোষণা করে। বাস্তবিকপক্ষে বৈদেশিক আক্রমণের সময় থেকে ভারতবর্ষের যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির যুগ শুরু হয়েছিল গুপ্তযুগ ছিল সেই উত্থানের শেষ অধ্যায়।

অর্থনৈতিক অবনতির সূচনা

১৩.১৪. গুপ্তযুগে ভারতীয় সংস্কৃতির উৎকর্ষ : পণ্ডিত ব্যক্তিরা গুপ্তযুগকে ভারত-ইতিহাসের 'ক্ল্যাসিক্যাল এজ' বলে অভিহিত করেছেন। ইংরেজীতে 'ক্ল্যাসিক্যাল এজ' বলতে বোঝায় এমন একটি সময় যখন সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতিতে উৎকর্ষ সাধিত হয়।

---

[১] "There are indications that the coastal areas of India carried on trade with South-east Asia. But this had little impact on the internal economy of the country." Ancient India : p. 102 ; D. N. Jha.

৪

'ক্লাসিক্যাল এজ'

'পেরিক্লিস যুগ'

একথা অনস্বীকার্য যে, গুপ্ত রাজাদের আমলে এমন কয়েকজন মনীষীর আর্বিভাব ঘটেছিল যাঁদের রচনায় সংস্কৃত সাহিত্য সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। তাছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ভারতীয় মনীষার চরম বিকাশ ঘটেছিল সেই আমলে। তখনকার শিল্পীরা স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় যে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন তার নিদর্শন আজও একেবারে লুপ্ত হয় নি। গুপ্তযুগে সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল গ্রীক ইতিহাসের 'পেরিক্লিস যুগে' তেমনি সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতিতে চরম গৌরবের দিন উপস্থিত হয়েছিল। অনুরূপভাবে ইংলণ্ডের ইতিহাসে রাণী এলিজাবেথ-এর আমলেও সভ্যতা-সংস্কৃতির চরম বিকাশ ঘটেছিল। সেই কারণে কোনো কোনো ঐতিহাসিক গুপ্তযুগের সঙ্গে 'পেরিক্লিসের যুগ' ও 'এলিজাবেথের যুগে'র তুলনা করেছেন।

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য

গুপ্তযুগে সাহিত্যের ভাষা ছিল সংস্কৃত। সমাজের উঁচু স্তরের মানুষ সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করতো। আর নিম্নস্তরের মানুষের কথ্য ভাষা ছিল প্রাকৃত। যাই হোক, দীর্ঘদিন ধরে রাজানুগ্রহ লাভের ফলে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য পল্লবিত হয়েছিল। গুপ্তসম্রাটদের আনুকূল্যে এই ভাষায় নতুন শক্তি সঞ্চারিত হয়। তখনকার কাব্য ও সাহিত্য ব্যতীত শিলালিপি এমনকি, মুদ্রাতেও সংস্কৃত ভাষা ব্যবহৃত হত। হরিষেণের এলাহাবাদ প্রশস্তিটিও সংস্কৃত ভাষায় রচিত।

কালিদাস, শূদ্রক, বিশাখদত্ত প্রমুখ

সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার ছিলেন কালিদাস। প্রবাদ আছে, তিনি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের নবরত্ন-সভার অন্যতম রত্ন ছিলেন। তাঁর কাব্য ও নাটকগুলির জনপ্রিয়তা আজও অক্ষুণ্ণ আছে। কালিদাসের অনন্যসাধারণ মহাকাব্য 'রঘুবংশে' দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সামরিক অভিযানের সামান্য ইঙ্গিত পাওয়া যায় ; আর 'কুমারসম্ভব' থেকে জানা যায় যে, গুপ্ত আমলে শিব-পূজার প্রচলন ছিল। কালিদাসের বিখ্যাত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' কে পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরাও বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটকের মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁর অপর দুটি রচনা হল 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' ও 'ঋতুসংহার'। কালিদাস ব্যতীত 'মৃচ্ছকটিকম্' নাটকের রচয়িতা শূদ্রক এবং ঐতিহাসিক নাটক 'মুদ্রারাক্ষস'-এর প্রণেতা বিশাখাদত্ত গুপ্তযুগেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। 'কীরাতার্জুনীয়ম্' গ্রন্থের রচয়িতা ভারবী এবং 'ভট্টিকাব্য' প্রণেতা ভট্টি সেই আমলেরই মানুষ ছিলেন।

পুরাণ ও মহাভারত

গুপ্তযুগে 'পুরাণ' বর্তমান রূপ লাভ করেছিল। পুরাণের উৎপত্তি হয়েছিল অনেক অনেক আগে যখন ঋষিরা ছিলেন এর রচয়িতা। কিন্তু এই সময়ে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা হিন্দু পূজা-পদ্ধতি ও আচার-ব্যবহার পুরাণ-এ সংযোজিত করেন, যার ফলে পুরাণ হিন্দুদের একটি শাস্ত্রগ্রন্থে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে মহাকবি ব্যাস অনেককাল আগে মহাভারত রচনা করলেও মূল রচনার সঙ্গে হাজার হাজার কবিতা এই সময় প্রক্ষিপ্ত হয়ে মহাকাব্যটি বর্তমান আকার ধারণ করেছিল। রামায়ণ যে আকারে আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে তারও চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হয় এই সময়।

একাধিক হিন্দু দার্শনিকের আবির্ভাবের ফলে নানা তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে ছয়টি দার্শনিক মতবাদ এই সময়েই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ছয়টি দর্শন হল ; ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য,

দর্শন ও ব্যাকরণ

যোগ, মীমাংসা ও বেদান্ত। হিন্দু দার্শনিকদের মধ্যে জৈমিনী ও ঈশ্বরকৃষ্ণ উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধ দার্শনিক অসঙ্গ ও বসুবন্ধু গুপ্তযুগেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পাণিনি ও পতঞ্জলিকে ভিত্তি করে সংস্কৃত ব্যাকরণেরও বিকাশ ঘটেছিল এই আমলে। সংস্কৃত ব্যাকরণগ্রন্থ 'অমরকোষ'-এর প্রণেতা অমরসিংহ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সভাসদ ছিলেন। ভর্তৃহরী ছিলেন সেই সময়কার অপর একজন বৈয়াকরণ। তাঁর রচনার নাম 'বাক্যপদীয়'।

বাৎস্যায়ন

প্রাচীন ভারত-ইতিহাসে দুইজন বাৎস্যায়ন-এর নাম পাওয়া যায়। একজন ছিলেন 'কামসূত্র'-রচয়িতা, আর অপরজন নৈয়ায়িক। নৈয়ায়িক বাৎস্যায়ন গুপ্তযুগে 'ন্যায়ভাষ্য' রচনা করে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তাঁর এই গ্রন্থ ন্যায়সূত্রের সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক ব্যাখ্যা হিসাবে স্বীকৃত। যৌনবিদ্যা সম্পর্কিত গ্রন্থ 'কামসূত্র'র প্রণেতা বাৎস্যায়নের আবির্ভাবকাল সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মতভেদ আছে। কারো কারো মতে তিনি খ্রীস্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, আবার অন্যদের মতে তিনি গুপ্তযুগের মানুষ। যাই হোক, কামশাস্ত্রের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রামাণ্য গ্রন্থ হল 'কামসূত্র'। এই গ্রন্থে প্রণয় ও কামকলার নানা দিক বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। তাছাড়া সমসাময়িক দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কেও অনেক তথ্য তা থেকে জানা যায়।

জ্ঞান-বিজ্ঞান

দশমিকের আবিষ্কার

গুপ্তযুগের অনেক আগেই ভারতীয় পণ্ডিতরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে রোমানদের সংস্পর্শে এসে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক আরও উন্নত হয়েছিল। গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায় আর্যভট্ট (বা আর্যভট) নতুন অনেক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যেগুলো 'আর্যভট্টীয়ম্ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়। পৃথিবীর আকার যে গোল এবং দিবা-রাত্রির কারণ যে পৃথিবীর আহ্নিক-গতি একথা তিনিই প্রথম প্রচার করেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এই যুগে ভারতীয় গণিতশাস্ত্রবিদদের দশমিক-ব্যবস্থার আবিষ্কার অংকশাস্ত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল; এবং বিশ্বের সর্বত্র প্রচারিত হয়েছিল। ভারতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে কে এর আবিষ্কর্তা ছিলেন তার নাম অবশ্য জানা যায় নি।[১] আর্যভট্ট ব্যতীত গর্গ, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত প্রমুখ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেক গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। বরাহমিহির জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষবিদ্যা সংক্রান্ত গ্রন্থ 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা' রচনা করেন। তাঁর জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত তত্ত্বের সঙ্গে গ্রীক জ্যোতির্বিদ্যার সাদৃশ্য আছে। আর্যভট্টের জনৈক শিষ্য লাটদেব ছিলেন সর্বসিদ্ধান্তগুরু, অর্থাৎ বিজ্ঞানের সব কয়টি শাখায় পারদর্শী। 'রোমক সিদ্ধান্ত' ও 'পাওলিসা' গ্রন্থদ্বয়ে তিনি নিজস্ব তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছিলেন।

---

[১] "The most epoch-making achievement of our age (Gupta Age) in the realm of arithmetic was the discovery of the decimal system of notation, now accepted and followed all over the world......When exactly the Hindu mathematicians made the epoch-making discovery is however not known. Nor has the name of the discoverer been preserved." New History of the Indian people P 380 : Majumder and Altekar.

চিকিৎসাশাস্ত্র ও ধাতুবিদ্যা

গুপ্তযুগের চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের মধ্যে সুশ্রুত-এর নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁর রচিত 'সুশ্রুত-সংহিতা' পরবর্তীকালে আয়ুর্বেদশাস্ত্রে উৎসাহ জাগিয়ে তুলেছিল। সুশ্রুত তাঁর গ্রন্থে আলোচনা করেছেন শল্য-চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার বিদ্যা সম্পর্কে। আলোচ্য সময়ে ধাতুবিদ্যার যে অগ্রগতি হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় সমসাময়িক মুদ্রা ও সীলমোহর থেকে। তাছাড়া গুপ্তরাজাদের আমলে ধাতু শিল্পীরা যে খুবই উন্নত মানের লোহা তৈরী ও ব্যবহার করতে জানতো তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তখনকার তৈরী দিল্লীর লোহার স্তম্ভটিতে আজও এতটুকু মরচে পড়েনি। বরাহমিহির তাঁর 'বৃহৎসংহিতায়' গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা ব্যতীত ধাতুবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র সম্পর্কে অনেক অমূল্য তথ্য সরবরাহ করেছেন। এইভাবে গুপ্তযুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সবকটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

শিক্ষা-ব্যবস্থা ও পাঠ্যসূচী

গুপ্তযুগে প্রাথমিক শিক্ষা কি পদ্ধতিতে দেওয়া হত সে বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কোনো তথ্য এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি, তবে উচ্চশিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষাদানের যে রীতিমত ব্যবস্থা ছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। ব্রাহ্মণ বিদ্যালয় ও বৌদ্ধমঠে বিদ্যাচর্চা চলতো। ব্রাহ্মণদের যে 'অগ্রহার'[1] ভূমি বা গ্রাম দান করা হত সেগুলোর অধিকাংশই ছিল উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র। তাছাড়া বারাণসী বা মথুরার মতো তীর্থস্থানও শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল। বৌদ্ধশিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে তক্ষশিলার গৌরব লুপ্ত হয়ে নালন্দা খ্যাতি অর্জন করে। নালন্দার খ্যাতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। গুপ্ত আমলে শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা দুই-ই দান করা হত। পাঠ্যসূচীর মধ্যে দর্শন, ইতিহাস, ব্যাকরণ, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি বিষয় ছিল।

শিল্পকলা

স্থাপত্য শিল্প

গুপ্তযুগের সংস্কৃতি আলোচনা তখনকার স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার বিবরণ ব্যতীত কখনই সম্পূর্ণ হতে পারে না। এর প্রধান কারণ হল সেই আমলে শিল্পকলার বিস্ময়কর উন্নতি ঘটেছিল। আরও বড় কথা, এই যুগের শিল্পরীতি পরবর্তী কালেও অনুসৃত হয়েছিল। প্রাচীন ভারতে শিল্পকর্মের পেছনে থাকত ধর্মীয় প্রেরণা। ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন শিল্পকর্মের নিদর্শন তাই খুব কমই আছে। গুপ্ত আমলে ঐ প্রাচীন ধারার কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ধরা পড়ে না। সেই যুগের স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন খুব কমই অবশিষ্ট আছে, অধিকাংশই নষ্ট হয়ে গিয়েছে প্রকৃতির নির্মম আঘাতে বা মুসলমানদের মূর্তি-ভাঙ্গার উন্মাদনার শিকার হয়ে। কারো কারো মতে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে গুপ্ত আমলের মন্দিরগুলোর ইট-কাঠ-পাথর পরবর্তী কালে সাধারণ মানুষ তাদের বাসগৃহ নির্মাণের কাজে ব্যবহার করেছিল। যাই হোক, সেই আমলে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়ের নির্মিত মন্দির-মঠের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে দেওগড়-এর বিষ্ণু মন্দির, সাঁচীর চৈত্য-গৃহ, দেওগড়, ভিটারগাঁও, ভিটোরি প্রভৃতি জায়গার মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গুপ্তযুগে ইট

---

[1] 'অগ্রহার' ভূমি বা গ্রাম কেবল ব্রাহ্মণদেরই দান করা হত। তিনি কর-রেহাই পেতেন এবং সাধারণতঃ

বা কাঠ দিয়েই মন্দির নির্মিত হত। মন্দির-নির্মাণ রীতির বৈশিষ্ট্য ছিল মাঝখানে গর্ভগৃহ বা উপাসনা ঘর, আর চারপাশে প্রাঙ্গণ।

ভাস্কর্য শিল্প

গুপ্ত ভাস্কর্য ভারতীয় শিল্পরীতিতে এক নতুন ধারা সৃষ্টি করেছিল। ডঃ আর ডি. ব্যানার্জী মন্তব্য করেছেন যে, এই যুগে ভারতীয় ভাস্কর্যশিল্প দীর্ঘদিনের পরাধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিল। বাস্তবিকপক্ষে এই সময়কার শিল্পীরা ইন্দো-গ্রীক বা গান্ধার শিল্পরীতির একঘেয়ে অনুকরণের পরিবর্তে ভাস্কর্যে নতুন শিল্প-পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। এই নতুন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ছিল 'সামঞ্জস্য, পরিপ্রেক্ষিত এবং ঔচিত্য'।[১] সারনাথে আবিষ্কৃত বুদ্ধমূর্তিগুলো সমসাময়িক ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বিষ্ণু, শিব এবং অন্যান্য হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তিতেও অনুরূপভাবে নতুন শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। মথুরা ব্যতীত সারনাথ ও বারাণসী ভাস্কর্য শিল্পের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল।

চিত্রশিল্প

গুপ্ত রাজাদের আমলে চিত্রকলা যথেষ্ট সমাদৃত হত। চিত্রশিল্পী ছাড়া সম্ভ্রান্ত এবং বিত্তশালী পরিবারের লোকেরাও ছবি আঁকতে জানতেন। অজন্তাগুহার দেওয়ালের ছবিগুলো শত শত বছর ধরে আঁকা হলেও বেশীর ভাগ অংশই গুপ্ত আমলের সৃষ্টি। গৌতম বুদ্ধের জীবন-কাহিনী অবলম্বনে যেসব ছবি অজন্তা গুহার দেওয়ালে আঁকা হয়েছে সেগুলো যেমন জীবন্ত তেমনি স্বাভাবিক। ছবিতে ব্যবহৃত রঙের বাহার সেগুলিকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে। বিস্ময়ের ব্যাপার হল এই যে, প্রায় চৌদ্দ শত বৎসর পরেও সেই রঙের উজ্জ্বলতা এতটুকু কমে নি।

* ১৩.১৫. গুপ্তযুগে ধর্মীয় জীবন : হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থান ? :

ফা-হিয়েন, যিনি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে এদেশে এসেছিলেন, তাঁর বিবরণীতে বলেছেন যে, তিনি সমসাময়িক যুগে বৌদ্ধধর্মের পতনের কোনো লক্ষণ দেখতে পান নি। তাসত্ত্বেও বিতর্কের কোনো অবকাশ না রেখে একথা বলা যেতে পারে যে, গুপ্ত রাজাদের আমলে এদেশে বৌদ্ধধর্ম হীনবল হয়ে পড়ে এবং হিন্দুধর্মের প্রাধান্য সূচিত হয়।

বৌদ্ধধর্মের পতন

গুপ্তসম্রাটরা হিন্দুধর্মাবলম্বী ও বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন, যার ফলে স্বাভাবিকভাবেই বৌদ্ধধর্ম রাজানুগ্রহ ও রাজপৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। তাছাড়া মহাযান বৌদ্ধধর্ম অনুসারে বুদ্ধ-পূজার প্রচলন ও নানা আচার-অনুষ্ঠানাদির পালন হিন্দুধর্মের সঙ্গে তার প্রভেদকে এতই কমিয়ে এনেছিল যে দুটি ধর্মকে আপাতদৃষ্টিতে আলাদা করে চেনাই দুষ্কর হয়ে পড়েছিল। এইসব কারণ ব্যতীত হিন্দুধর্মের রূপান্তরও বৌদ্ধধর্মের ক্রমাবনতির জন্য দায়ী ছিল। একথা অবশ্য স্মরণ রাখতে হবে যে, সেই সময় হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের মধ্যে রেষারেষির কোনো প্রশ্ন ছিল না। গুপ্তসম্রাটরা বৌদ্ধধর্মের প্রতি কোনো বিদ্বেষ তো পোষণ করতেনই না, বরঞ্চ তাঁরা ঐ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

গুপ্তরাজাদের আমলে হিন্দুধর্মের প্রাধান্য একটি লক্ষণীয় বস্তু। গুপ্তরাজারা হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, কিন্তু এই পৃষ্ঠপোষকতাই যে হিন্দুধর্মের প্রাধান্যের

---

[১] 'Symmetry' perspective and natural proportion'